أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.74) www.motaher21.net

تَنٰجَوْا بِالْبِرّ

"সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো।"

" Counsel for righteousness."

সুরা: আল-মুজাদিলাহ

আয়াত নং :-৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হও তখন পাপ, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার কথা বলাবলি করো না, বরং সততা ও আল্লাহভীতির কথাবার্তা বল এবং যে আল্লাহর কাছে হাশরের দিন তোমাদের উপস্থিত হতে হবে, তাঁকে ভয় কর।

৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

মু'মিনের সকল কাজ হবে সৎ ও তাক্বওয়ার সাথে, এমনকি কোন বিষয়ে গোপন পরামর্শ করার প্রয়োজন হলেও কেননা গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজে গোপন পরামর্শ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা শয়তানের কাজ।

النَّجْوٰي (নাজওয়া) বলা হয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে গোপন পরামর্শ করা। এটা ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে ভালকাজে গোপন পরামর্শ করতে অনুমতি প্রদান করেছেন আর খারাপ কাজে গোপন পরামর্শ করা নিষেধ করেছেন। তবে তিন বা ততোধিকের উপস্থিতিতে দুইজনে আলাদা হয়ে গোপন পরামর্শ করা নিষেধ, তা কোন ভাল কাজে হলেও। কারণ এতে তৃতীয়জন কষ্ট পায় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : যখন তিনজন থাকবে তখন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দু জনে গোপন পরামর্শ করবে না। (সহীহ বুখারী হা. ৬২৮৮)

(نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰي)

এখানে মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের পাশ দিয়ে কোন মুসলিম অতিক্রম করে গেলে তারা বসে গোপন পরামর্শ করত। ফলে মু'মিনরা ধারণা করতো যে, তারা হয়তো আমাদের হত্যা করার জন্য গোপন পরামর্শ করছে। তাই মু'মিনরা এরূপ অবস্থা দেখলে ভয়ে পথ বর্জন করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এরূপ কার্যকলাপ থেকে নিষেধ করলেন কিন্তু তারা উপেক্ষা করে তাতেই লিপ্ত হয়, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : আয়াতটি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা নিজেরা পরস্পর গোপন পরামর্শ করত আর মু'মিনদের দিকে তাকাত ও চোখ টিপ মারত। মু'মিনরা মনে করত তাদের কাছে হয়তো আমাদের ভাইদের কোন হত্যা, মসিবত বা দুঃসংবাদ পৌঁছেছে তাই তারা এরূপ করছে। এতে মু'মিনরা খুব কষ্ট অনুভব করত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অধিক হারে অভিযোগ করতে লাগল, তিনি তাদেরকে বারণ করলেন কিন্তু তারা মানল না, তখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয় (কুরতুবী)।

(وَإِذَا جَاْءُوْكَ حَيَّوْكَ....)

'তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এমন শব্দে অভিবাদন করে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি' ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলত : اَلسَّامُ عَلَيْكَ আপনার মৃত্যু হোক। এর মাধ্যমে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গালি দিত। আর বলত : আমাদের কথার কারণে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের শাস্তি না দিত! তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ২/১৭০, বায়হাকী ৭/১২১ হাসান)

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করল এবং বলল

السام عليك يا ابا القاسم

হে আবূল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক। আয়িশাহ (রাঃ) বললেন :

عليك السام واللعنة

তোমার মৃত্যু হোক এবং তোমার ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হে আয়িশাহ আল্লাহ তা'আলা খারাপ ও যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকে ভালবাসেন না। আয়িশাহ (রাঃ) বলছেন : আপনি কি তাদের কথা শোনেননি তারা আপনার মৃত্যু কামনা করছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি কি শোননি, আমি তাদের জবাবে কী বলেছি? অর্থাৎ তোমাদেরও এরূপ হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। (সহীহ বুখারী হা. ৬২৫৬)

সুতরাং একজন মু'মিন অন্য মু'মিনকে এমন শব্দ দ্বারা অভিবাদন করবে যা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিখিয়েছেন। অমুসলিমদের তৈরি করা অভিবাদন বা শরীয়ত গর্হিত শব্দ দ্বারা অভিবাদন জানানো মুসলিমদের আচরণ নয়।

(وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓأَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ)

'আর তারা মনে মনে বলে : কেন আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না, আমরা যা বলি তার কারণে' তারা বলে, যদি মুহাম্মাদ সত্য নাবী হত তাহলে আমরা যা বলি সেজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শাস্তি দিতেন, আল্লাহ তা'আলা কেন শাস্তি দিচ্ছেন না? আরো বলত, তিনি সত্য নাবী হলে তার দ'ুআ কবুল হয়ে যেত; ফলে আমরা মরে যেতাম। এটা তাদের জন্য আশ্চর্যজনক কথা। কারণ তারা আহলে কিতাব, তারা জানে নাবীরা কারো প্রতি রাগ করলেই তাদের জন্য দ্রুত আযাব কামনা করেন না। বরং তাদের কর্মের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

(وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ)

'গোপন পরামর্শ করে পাপকার্যে, সীমালঙ্ঘনে ও রাসূলের অবাধ্যাচরণে' অর্থাৎ নিজেদের মাঝে এমন পাপ কাজের শলাপরামর্শ করত যা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(إِنَّمَا النَّجْوٰي مِنَ الشَّيْطٰنِ)

অর্থাৎ পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবাধ্যতার বিষয়ে গোপন পরামর্শ করা হল শয়তানের কাজ। শয়তান তাদেরকে এ গোপন পরামর্শ করায় মু'মিনদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। তারা মু'মিনদের কোন প্রকার কষ্ট বা ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করলে। অতঃপর মু'মিনদের উচিত শয়তানের প্ররোচনায় প্রভাবিত না হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা। মু'মিনরা কষ্ট পায় এমন বিষয় বা প্রেক্ষাপটে গোপন পরামর্শ করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ، فَلاَ يَتَنَاجَي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ

যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন দ্বিতীয়জনকে বাদ দিয়ে গোপন পরামর্শ করিও না কেননা এতে সে চিন্তায় পতিত হবে। (সহীহ বুখারী হা. ৬২৯০)

সুতরাং মু'মিনদের প্রত্যেক কাজ হবে কল্যাণকর ও তাকওয়াপূর্ণ। তারা কখানো মানুষের ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতি করার জন্য কাউকে গোপনে পরামর্শও দেবে না। বরং যারা অপরের ক্ষতি করার জন্য পরামর্শ দেয় তারা শয়তানের অনুসারী।

এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, পরস্পর আলাপ-আলোচনা করা মূলত কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়। যারা এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করে তারা কেমন চরিত্রের লোক, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতেতে এরূপ আলোচনা করা হয় তা কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং যে কথাবার্তা এভাবে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় তা কি ধরনের কথাবার্তা, তার ওপরই এর বৈধতা বা অবৈধতা নির্ভরশীল। সমাজে যাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নির্মল চরিত্রের সর্বব্যাপী-খ্যাতি ও পরিচিতি বিরাজমান, তারা কোথাও গোপন পরামর্শে লিপ্ত দেখলে কারো মনে এরূপ সন্দেহ জন্মে না যে, তারা কোন দুরভিসন্ধিতে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজে যারা অনাচার ও অপকর্মের হোতা এবং দুশ্চরিত্র রূপে খ্যাত, তাদের গোপন সলাপরামর্শ যে কোন মানুষের মনে এরূপ খটকা ও শংকার জন্ম দেয় যে, একটা কিছু গোলযোগ পাকানোর প্রস্তুতি নিশ্চয়ই চলছে। ঘটনাচক্রে কখনো দু'চার ব্যক্তি কোন ব্যাপারে চুপিসারে কিছু আলোচনা সেরে নিলে সেটা কোন আপত্তিকর ব্যাপার হয় না। কিন্তু কিছু লোক যদি নিজেদের একটা আলাদা স্থায়ী দল বানিয়ে নেয় এবং সাধারণ মুসলামানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হরহামেশা গোপন সলাপরামর্শ চালাতে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই একটা দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ। আর না হোক, এ দ্বারা অন্তত এতটুকু ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী যে এতে মুসলমানদের মধ্য দলাদলির ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি, যে জিনিসের ওপর এসব গোপন সলাপরামর্শের বৈধ বা অবৈধ হওয়া নির্ভর করে। তা হচ্ছে এ গোপন সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। দুই, ব্যক্তি যদি কোন ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কারো কোন ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়ে দেয়ার মানসে অথবা কোন ভালো কাজে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে গোপন

আলাপ আলোচনা করে, তবে তা কোন অন্যায় কাজ নয়, বরং তা সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য যদি হয় কোন গোলযোগ ও নাশকতা সংঘটিত করার চক্রান্ত করা, কারো অধিকর নষ্ট করা কিংবা কোন পাপকাজ সংঘটিত করার ফন্দি আঁটা--তাহলে এরূপ অসদুদ্দেশ্য পোষণ করাটাই যে এক দুষ্কৃতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই অসদুদ্দেশ্য নিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা দ্বিগুণ পাপ ও দুষ্কৃতি।

এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রসূল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে, اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذالك يحزنه

"যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

অপর হাদীসে রসূল ﷺ বলেনঃ فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فان ذلك يحزنه

"তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনে গোপনে আলোচনা করা চাই না। কারণ সেটা তার জন্য মনোপীড়াদায়ক হবে।" (মুসলিম)

দুই ব্যক্তি যদি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতেই সে বুঝতে পারে না এমন ভাষায় কথা বলে, তাবে সেটাও এ অবৈধ গোপন সংলাপের আওতায় আসে। এর চেয়েও জঘন্য অবৈধ কাজ--হলো গোপন সংলাপের সময় কারো দিকে এমনভাবে তাকানো বা ইশারা করা, যাতে বুঝা যায় যে, তাকে নিয়েই তাদের কথাবার্তা চলছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. পাপকাজ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্য কাজে গোপন পরামর্শ করা নিষেধ।

২. সৎকাজে গোপন পরামর্শ করা বৈধ।

৩. অসৎকাজে গোপন পরামর্শ করা শয়তানের কাজ।

৪. কোন স্থানে তিনজন থাকলে একজনকে রেখে দু জন মিলে গোপন পরামর্শ করা নিষেধ, যতক্ষণ না তৃতীয়জনের অনুমতি নেয়া হয়।

৫. ভরসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর, অন্য কারো ওপর নয়।

সুরা: আল-মুজাদিলাহ

আয়াত নং :-১১

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

হে ঈমানদারগণ! মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হলে জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন চলে যেতে বলা হবে, তখন চলে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

১১ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে মুনাফিকরা মজলিস পূর্ণ করে বসে থাকত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আগন্তুকদের জন্য জায়গা করে দিতে বলতেন কিন্তু তারা নির্বিকার থাকত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদের সাবধান করে দেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে, বরং জায়গা করে দাও, আল্লাহও তোমাদের জন্য তা করে দেবেন।" [বুখারী: ৬২৭০, মুসলিম: ২১৭৭]

ইসলাম মজলিসের সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু শিষ্টাচার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেমন: কেউ কারো জন্য নিজের বসার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না বরং অন্যকে জায়গা করে দিবে। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৮, ৪৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে অপর কাউকে বসাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। বরং তোমরা প্রশস্ত কর এবং বড় করে নাও"। [বুখারী: ২৬৭০]

তাই কোন ব্যক্তি আগমন করলে তার জন্য কি দাঁড়াতে হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কারও কারও মতে, আগমনকারীর জন্য দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। তারা তাদের মতের সপক্ষে রাসূলের হাদীস "তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি দাঁড়িয়ে যাও" [বুখারী: ৩০৪৩, মুসলিম: ১৭৬৮] কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণ

এটা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের দলীল হলো, রাসূলের হাদীস, “কেউ যদি এটা পছন্দ করে যে, মানুষ তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার অবস্থান করে নিল” [তিরমিয়ী: ২৭৫৫] তারা পূর্ববর্তী হাদীসে উত্তরে বলেন, হাদীসের শব্দ হলো, قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ যার অর্থ, তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার প্রতি ধাবিত হও। এর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ فأنزلُوه

অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি ধাবিত হয়ে তাকে নামিয়ে নাও” [মুসনাদে আহমাদ: ৬/১৪১-১৪২] এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এখানে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নেয়ার জন্যই দাঁড়াতে বলা হয়েছে। কারণ; তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন সে জন্য হাঁটতে অক্ষম ছিলেন। ফলে তাকে বাহন থেকে নামিয়ে নেয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কারো জন্য দাঁড়ানোর পক্ষে শক্তিশালী কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন আলেম অবশ্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে, সাধারণ অবস্থায় যেভাবে মানুষ মানুষকে দাঁড়াতে বাধ্য করে সেভাবে জায়েয নেই, তবে কেউ সফর থেকে আসলে বা কোনো ক্ষমতাশীলের ক্ষমতায় প্রবেশ করলে ক্ষমতাশীলের প্রতি সম্মান করতে ও তার নির্দেশ বাস্তবায়ন ও তার সম্মানের দিকে খেয়াল রেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয এবং এটা হিকমতেরও চাহিদা। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সা'দ ইবনে মু'আয এর মধ্যে তার নির্দেশ ও ফয়সালা বেশী গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে দেখলেই দাঁড়াতে হবে এটা শরীআত সমর্থিত নয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, “সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রিয় ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি যখন মজলিসে আগমন করতেন তখন তারা দাঁড়াতোনা, কারণ; তারা জানতো যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।” [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৩২, তিরমিয়ী: ২৭৫৪]

এমনকি সাহাবায়ে কিরাম যখনই রাসূলের মজলিসে আসতেন তখনই তারা যেখানে বসা শেষ হয়েছে সেখানে বসতেন। [আবু দাউদ: ৪৮২৫, তিরযিমযী: ২৭২৫] তবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা রাসূলের নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন তারা আসলে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কিরাম তাদের জন্য জায়গা করে দিতেন। আর রাসূলই এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে থাকে”। [মুসলিম: ৪৩২, আবু দাউদ: ৬৭৪]

সে হিসেবে আবু বকর সাধারনত তার ডান পাশে, উমর বাম পাশে, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম সামনে বসতেন। কারণ: তারা ওহী লিখতেন। তবে কোন ক্রমেই কারও অনুমতি ব্যতীত দু'জনের মাঝখানে বসে দু'জনের মধ্যে পৃথকীকরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “কোন লোকের পক্ষে এটা জায়েয নয় যে, সে দু'জনের মাঝে পৃথকীকরণ করে বসবে তাদের অনুমতি ব্যতীত”। [আবু দাউদ: ৪৮৪৫, তিরমিয়ী: ২৭৫২, মুসনাদে আহমাদ: ২/২১৩]

মুজাহিদ বলেন, এখানে “উঠ” বলে যাবতীয় কল্যাণকর কাজ করার জন্য নির্দেশ বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যখনই তোমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াতে, অথবা সৎকাজ করতে বা কোন হক আদায় করতে বলা হয় তখনই তোমরা তা করতে সচেষ্ট হবে। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ যখনই তোমাদেরকে কোন কল্যাণকর কাজের আহবান জানানো হয় তখনই তোমরা তার প্রতি সাড়া দিও। [কুরতুবী]

অর্থাৎ কাউকে তার বসা থেকে সরে অন্যকে বসার জায়গা করে দেয়া বা রাসূল ও দ্বীনী নেতারা যদি কাউকে বের হতে বলে যদি তোমরা কর তবে এটা মনে করো না যে, এর দ্বারা তোমাদের সম্মানের কোন কমতি করা হচ্ছে বা তোমাদেরকে অবমুল্যায়ণ করা হচ্ছে। বরং আল্লাহর নিকট এ নির্দেশ পালনের মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তার এ ত্যাগ কখনো খাটো করে দেখবেন না। তিনি তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন। কেননা; যে কেউ মহান আল্লাহর দিক বিবেচনা করে বিনম্র হয় মহান আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। আর তার স্মরণকে উচু করে দেন। আর এ জন্যই পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হয়েছে, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।” তিনি ভাল করেই জানেন কারা উঁচু মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী আর কারা নয়। [ইবন কাসীর]

আবুত তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নাফে' ইবনে হারেসকে উসফান নামক স্থানে দেখা পেলেন। তিনি তাকে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উপত্যকাবাসী (মক্কা) এর উপর কাকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছ? আমের বললেন, আমি ইবনে আবদ্যার উপর তাদের দায়িত্ব দিয়েছি। উমর বললেন, ইবনে আবযা কে? তিনি বললেন, আমাদের এক দাস। উমর বললেন, তাদের উপর তুমি দাসকে দায়িত্বশীল করেছ? তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন ! সে আল্লাহর কিতাবের একজন সুপাঠক, ফারায়েজ সম্পর্কে পণ্ডিত ও বিচারক। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তাহলে শোন, আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ্ এ কুরআন দ্বারা কাউকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবেন আর কাউকে অধঃপতন ঘটাবেন।” [মুসলিম: ৮১৭]

সূরার ভূমিকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কতক মুফাসসির এ আদেশকে শুধুমাত্র রসূল ﷺ এর মজলিসের মধ্যে সীমিত মনে করেছেন। তবে ইমাম মালেক প্রমূখের এ মতটিই সঠিক যে, মুসলমানদের সকল বৈঠকাদির জন্য এটি একটি স্থায়ী বিধি। আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুসলিম জাতিকে যে সামাজিক রীতি-নীতি, আদব আখলাক ও আচার-ব্যবহার শিখিয়েছেন। এটি তার অন্যতম। আগে থেকে কিছু লোক বসে আছে এমন একটি মজলিসে যখন আরো কিছু লোক যোগ দেবে, তখন আগের সমবেত লোকদের মধ্যে এ সৌজন্য বোধ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নবাগতদের জন্য জায়গা করে দেবে এবং নিজেরা যথাসম্ভব চেপে বসে তাদের বসার সুযোগ করে দেবে। আবার নবাগতদের মধ্যেও এতটা ভদ্রতা থাকা উচিত যে, তারা যেন জোর জবরদস্তির সাথে ভেতরে না ঢোকে এবং একজনকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল ﷺ বলেছেনঃ

-لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا

“কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় না বসে। তোমরা বরং স্বেচ্ছায় অন্যদের জন্য জায়গা করে দাও।” (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন যে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما

“দু’জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া জোর পূর্বক চেপে বসা বৈধ নয়।” (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম জানান যে, লোকেরা রসূল ﷺ এর মজলিসে দীর্ঘ সময় বসে থাকতো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে অনেক সময় রসূল ﷺ এর কষ্ট হতো। তাঁর বিশ্রামের যেমন বিঘ্ন ঘটতো, তেমনি কাজকর্মেও অসুবিধার সৃষ্টি হতো। এজন্য এ আদেশ নাযিল হয় যে, যখন চলে যেতে বলা হয় তখন চলে যাও। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ এরূপ ভেবো না যে, রসূল ﷺ এর মজলিসে অন্যদেরকে জায়গা করে দিতে গিয়ে যদি তোমাদের তার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসতে হয় তাহলে তোমাদের সম্মান হানি ঘটবে, কিংবা তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হলে তোমাদের অবমাননা হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির আসল উৎস হলো ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান। রসূল ﷺ এর মজলিসে কে তাঁর কতটা নিকটে বসলো এবং কে কত বেশী সময় বসে কাটালো, তা দ্বারা কারো সম্মান নিরূপিত হয় না। কেউ যদি রসূল ﷺ এর খুব কাছাকাছি বসতে পারে। তাহলেই যে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে তা নয়। মর্যাদা বাড়বে তারই যার ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান বেশী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বেশী সময় বসে থেকে আল্লাহর রসূলকে বিব্রত করে তাহলে সে বরঞ্চ মূর্খতার কাজই করে। শুধুমাত্র রসুলের ﷺ কাছে অধিকতর মর্যাদা হবে সে ব্যক্তির যে রসূল ﷺ এর সাহচর্য দ্বারা ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের মত অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছে এবং মু’মিন সুলভ স্বভাব ও চরিত্র অর্জন করেছে।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজলিসের আদব শিক্ষা দিচ্ছেন এবং জ্ঞানীদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করছেন।

যখন মু'মিনরা কোন মজলিসে একত্রিত হবে তখন যদি আগত লোকদের জন্য মজলিসে জায়গা করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে নড়েচড়ে বসে মজলিসে জায়গা করে দেবে। কেননা আগত লোকজন এসে দাঁড়িয়ে থাকবে বা কোন বসা লোককে উঠিয়ে দিয়ে বসতে হবে এমন যেন না হয়। কারণ এ দুটিই আদবের খেলাফ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং মজলিসের জায়গাকে প্রশস্ত করে দাও। (সহীহ বুখারী হা. ৬২৬৯)

অন্যত্র তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার জায়গা থেকে চলে গিয়ে ফিরে আসলে সে ব্যক্তি উক্ত জায়গার বেশি হকদার। (সহীহ মুসলিম হা. ২১৭৯)

আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানস্বরূপ তোমাদেরকে জান্নাতে অতীব প্রশস্ত স্থান দান করবেন। অথবা যেখানেই প্রশস্ততা কামনা করবে সেখানেই তিনি তা দান করবেন। যেমন বাড়িতে প্রশস্ততা, রুযীতে প্রশস্ততা এবং কবরে প্রশস্ততা ইত্যাদি।

(وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا)

'যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও' অর্থাৎ জিহাদের জন্য, সালাতের অথবা কোন ভাল কাজের জন্য যেতে বলা হয়, তখন সত্বর উঠে চলে যাও। আব্দুর রহমান বিন জায়েদ বলেন : সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসতেন তখন প্রত্যেকেই চাইতেন যে, তিনি সবশেষে যাবেন। কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রয়োজন থাকত; ফলে তাঁর জন্য এটা কষ্টকর হয়ে যেত। তাই নির্দেশ দেওয়া হল যখন চলে যেতে বলা হবে তখন যেন তারা চলে যায়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰي لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ)

“যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’, তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।” (সূরা নূর ২৪ : ২৮)

(يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ)

অর্থাৎ ঈমানদারদের মর্যাদা বেঈমানদারদের ওপর এবং (ঈমানদার) শিক্ষিতদের মর্যাদা অশিক্ষিত সাধারণ ঈমানদারদের থেকে অনেক বেশি। ঈমানদার আলেমদেরকে আখিরাতে নেকী অনেক বেশি দেওয়া হবে আর দুনিয়াতে অনেক মর্যাদা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : আলেমের মর্যাদা ইবাদতকারীর ওপর তেমন যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকার ওপর। (আবূ দাঊদ হা. ৩৬৪১)

অন্যত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

আলেমরাই নাবীদের ওয়ারিশ। এছাড়া আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ..... وَاَطْهَرُ ث فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে প্রত্যেক মু’মিন নির্জনে কথা বলার আশা করত। কিন্তু সবার সাথে নির্জনে কথা বলার সুযোগ দেওয়া তো একা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন : অনেক মুনাফিকরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে চুপিচুপি কথা বলতে গিয়ে সময় নষ্ট করত। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ জারী করে দিলেন যে, যারাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নির্জনে কথা বলতে চাইবে তারাই যেন সদকা প্রদান করে। এটা তাদের জন্য উত্তম অর্থাৎ সদকাহ প্রদান করে কথা বলা। কেননা এর মাধ্যমে তাদের অনেক কল্যাণ হাসিল হবে। কিন্তু এ নির্দেশ সাহাবীদের জন্য কষ্টকর হয়ে গেলে আল্লাহ তা‘আলা বিধানটি হালকা করে দিলেন। তাই পরবর্তী আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। (ইবনু কাসীর)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বেশি বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করত, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুশকিলে নিপতিত করত। আল্লাহ তা‘আলা চাইলেন এ সমস্যা থেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উত্তরণ করতে, তাই তিনি পরবর্তী আয়াত নাযিল করলেন (কুরতুবী)। এছাড়াও এ সম্পর্কে আরো বর্ণনা রয়েছে।

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন : আয়াতটি রহিত হয়নি, বরং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মানার্থে হুকুমটি বলবৎ আছে। তবে কেউ সদকাহ না দিলে আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। (তাফসীর সা'দী)

তাই ফরয সালাত, যাকাত ও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের আনুগত্য করলেই সদকার পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

সুরা: আল-মুজাদিলাহ

আয়াত নং :-১২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রসুলের সাথে গোপন আলাপ কর তখন আলাপ করার আগে কিছু সাদকা দিয়ে নাও। এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ও পবিত্র। তবে যদি সদকা দিতে কিছু না পাও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১২ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলিমও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রাসূলের সাথে

একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। এ নির্দেশের পর অনেকেই কানকথা বলা থেকে বিরত থেকেছিল। এর পরই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াত নাযিল করে মুমিনদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিলেন। ফলে কারা সত্যিকার মুমিন আর কারা কপট তা ধরা পড়ে গেল। [তাবারী।]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে এ আদেশের কারণ এই যে, মুসলমানরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (নির্ভৃতে কথা বলার আবেদন জানিয়ে) এত বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতো যে, তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর ওপর থেকে এ বোঝা হালকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ইবনে জারীর) যায়েদ বিন আসলাম বলেন যে, যে কেউ রসূল ﷺ এর সাথে নিভৃতে কথা চলতে চাইতো, তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতেন না। যার ইচ্ছা হতো, এসে বলতো, আমি একটু নিভৃতে কথা বলতে চাই। আর রসূল ﷺ তাতে সম্মতি দিতেন। এতে পরিস্থিতি এত দূর গড়ালো যে, নিভৃত বলার আদৌ প্রয়োজন হয় না এমন ব্যাপারেও অনেকে রসূল ﷺ কে কষ্ট দিতে লাগলো। এ সময়টা ছিল এমন যে, সমগ্র আরব মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কখনো কখনো এমনও হতো যে, কোন ব্যক্তি এভাবে রসূল ﷺ এর অমুক গোত্র কবে মদিনায় আক্রমণ চালাবে সে খবর দিয়ে গেল। এভাবে মদীনার গুজবের ছড়াছড়ি হতো। অপরদিকে মুসলমানদের এরূপ আচরণের দরুন মুনাফিকরা একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে যা বলে তাই শোনেন, সত্য মিথ্যার বাছ-বিচার করেন না। এসব কারণে আল্লাহ এ বিধি-নিষেধ আরোপ করলেন যে, যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইবে, তার আগে সাদকা দিতে হবে। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী) কাতাদাহ বলেন যে, অন্যদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ রসূল ﷺ এর সাথে নিভৃতে কথা বলতো।

হযরত আলী (রা.) বলেনঃ এ আদেশ নাযিল হবার পর রসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সাদকা কত ধার্য করা উচিত? এক দীনার? আমি বললাম, এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে। তিনি বললেনঃ আধা দীনার? আমি বললাম, এটাও তাদের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। তিনি বললেন, তাহলে কত? আমি বললাম, একটা জবের দানা পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বললেন, انك لزهيد অর্থাৎ তুমি খুবই কম পরিমাণের পরামর্শ দিলে। (ইবনে জারীর, তিরমিযী, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অপর এক বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা.) বলেনঃ এটি কুরআনের এমন এক আয়াত যা আমি ছাড়া আর কেউ বাস্তবায়িত করেনি। এ আদেশ আশা মাত্রই আমি একটি সাদকা দিয়ে রসূল ﷺ এর কাছ থেকে একটি মাসায়ালা গোপনে জেনে নেই। (ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনুল মুনযির, আবদ বিন হুমাইদ)

☆ আল্লাহর রাজ্যে সকল প্রকার শিক্ষা ও পর্যালোচনা সকলের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু মানুষের স্বভাব দুর্বল। মানুষ চায় বিশেষ শিক্ষা ও পর্যালোচনা ব্যক্তিগতভাবে তার শিক্ষক তথা রাসূল (সঃ)এর সাথে। এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন- (১) তারা ভাবতে পারে যে তাদেরটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা যেটা তারা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করতে চায়না। (২) তাদের স্পর্শকাতরতা অথবা বিশেষ আত্মমর্যাদা বোধ থাকতে পারে যেটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনার দ্বারাই তৃপ্তি পেতে পারে (৩) এমনকি তারা শিক্ষক তথা রাসূল (সঃ) এর সময়কে এককভাবে পাওয়ার মত স্বার্থপরতায়ও ভুগতে পারে। এগুলো পর্যায়ক্রমে বর্জনীয়; তথাপিও মানুষের দুর্বলতা বিবেচনায় এগুলো এতবেশী তিরস্কারযোগ্য নয় যে তাদেরকে উন্নয়নের সুযোগ না দিয়ে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে-

তারা যেন এ ধরনের একাকীত্বে রাসূল (সঃ) এর সাথে কথা বলার আগে নিজেদের গরীব ভাইদের জন্য কিছু দান করে । ফলে তারা এ ধরনের একাকীত্বে গোপন কথা বলার আগে চিন্তা করতে বাধ্য হলো এধরনের কথা বলার যৌক্তিকতা কতটুকু। এবং স্বভাবতই মানুষের যেহেতু অর্থ সম্পদের প্রতি মোহ বেশী তাই তারা এধরনের সুযোগ গ্রহণ করা থেকে তথা রাসূল (সঃ) এর মূল্যবান সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকল। এটা যেহেতু তাদের ক্ষমাযোগ্য একটি লঘু অপরাধের লঘু শাস্তি তথা জরিমানা তাই তারা জরিমানা দিয়ে নিজেদের অপরাধ কিছুটা ঢাকতে পারত। এতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অপরাধ সংশোধিত হয়ে গেল। এখানে লক্ষণীয়, আয়াতটিতে এধরনের দান বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কারণ যারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল তাদের জরুরী কথা বলা থেকে তারা যেন বিরত থাকতে বাধ্য না হয়। এ জন্যই এব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের কাজ হয়ে গেল। যখন লোকজন নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং সংশোধিত হয়ে গেল তখন পরবর্তী আয়াতে এ প্রথা রহিত করে দেয়া হল। হাদীস থেকে এ প্রথার কার্যকারিতার মেয়াদ সর্বোচ্চ দশদিন বলে জানা যায়।

অতএব প্রয়োজন ব্যতীত ব্যস্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সময়কে একাকীত্বে পাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত নয় বরং উচিত তাদের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা।